শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে বিশেষ ফিচার

পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু ফাঁসির রায়েও অটল ছিলেন সংকল্পে

মুহাম্মদ শামসুল হক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৫৫ বছর জীবনকালে প্রায় ১৩ বছরই কারাগারে কাটিয়েছেন। এর মধ্যে বাঙালি জাতির জন্য সবচাইতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও শ্বাসরুদ্ধকর সময় কেটেছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর পাকিস্তানের কারাগারে। সেখানে তিনি বন্দি ছিলেন ২৮৯ দিন। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সামরিক আইনে এক প্রহসনের বিচারে তাঁকে ফাঁসির দন্ড দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ বাঙালিদের প্রাণের দাবি ছয় দফা তথা স্বাধিকার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া খান-ভুট্টোর মধ্যে আলোচনা ভেঙে যায়। ইতোমধ্যে সামরিক সরকার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা-চট্টগ্রামসহ প্রধান শহরগুলোতে গোপনে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। সন্ধ্যা থেকে খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের আত্মগোপনে গিয়ে শত্রু'র মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজে ধরা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, তিনি আত্মগোপনে গেলে তাঁকে না পেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ব্যাপক নিরীহ মানুষকে হত্যা করবে। এদিকে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুলিশ, বিডিআরসহ নিরস্ত্র জনতার ওপর গণহত্যা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসসহ একাধিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর রাত প্রায় দেড়টার দিকে সেনাবাহিনী তাঁর বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। শুরু হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ। পরে জানা যায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর তাঁকে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাসে এবং পরদিন পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিরোধ তথা বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার খবরটি মানুষ প্রথমদিকে জানতে পারেনি। ইয়াহিয়া-ভুটো ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তান চলে যান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান করাচি গিয়ে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। নানারকম গুজব ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা অবস্থার একটি ছবি করাচির পত্রিকায় ছাপা হলে বিশ্বব্যাপী জানাজানি হয় বাঙালির নেতাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরপর থেকে চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়, চলতে থাকে প্রতিবাদ, উঠতে থাকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি।

প্রথমদিকে সাংবিধানিক আদালতে তাঁর বিচার হবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেও পরে তা ভঙ্গ করে বিচার শুরু করেন সামরিক আদালতে। ১১ জুলাই ইয়াহিয়া সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচারের জন্য তাঁর ওপর পাকিস্তানি জেনারেলদের চাপ রয়েছে উল্লেখ করেন এবং প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলেন, 'বাঙালি নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে সুস্থ এবং জীবিত আছেন। তবে আজকের পর শেখ মুজিবের কপালে কী ঘটবে তা আমি হলফ করে বলতে পারব না।বিচার চলাকালে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তিনজন সহকারীসহ নিয়োগ করা হয় পাকিস্তানি আইনজীবী এ কে ব্রোহীকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই প্রহসনের বিচার প্রত্যাখ্যান করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন কিংবা আইনজীবীর সহযোগিতা নিতে অস্বীকার করেন।

১৩ অক্টোবর ১৯৭১, নিউইয়র্কের হেরাল্ড ট্রিবিউন জানায়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে ট্রাইব্যুনালের সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। গোপন এ বিচারের রায় পাকিস্তানের সব কূটনৈতিক মিশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক ট্রাইব্যুনালের ওই রায় কার্যকর না করার জন্য ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির রায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত প্রবল হয়ে উঠে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানসহ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রায় কার্যকর না করে তাঁর মুক্তির ব্যাপারে চাপ সৃষ্টির জন্য অনুরোধ জানান। পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশের মুক্তিকামী মানুষ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জোর দাবি ওঠে। তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাকিস্তান সরকারকে চাপ দেন বহু রাষ্ট্রনেতা।

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে হামলা চালালে ভারতও এ যুদ্ধে সরাসরি যুক্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানে সামিল হয়। ওই দিনই বঙ্গবন্ধুকে ফয়সালাবাদ কারাগার থেকে মিয়ানওয়ালি কারাগারে সরিয়ে নেওয়া হয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর যৌথ বাহিনীর অভিযান তীব্র হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বার ৯৩ হাজারের বেশি পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদসহ বাংলাদেশের নেতারা বঙ্গবন্ধুকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান।

তারপরও ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর পেয়ে মিয়ানওয়ালি কারাগারে গুজব ছড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। ২০ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু গোপন স্থানেই ছিলেন। পরে ভুট্টোর আগ্রহে তাঁকে সিহালি অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টোকে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। তিনি ভুট্টোকে রায় কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

টাইমস সাময়িকীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সত্যিকার অর্থে মুজিবকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া ভুট্টোর উপায় ছিল না। মুজিবকে বন্দি রেখে পাকিস্তানের কোনো লাভ হবে না বলেই মনে করেছিলেন ভুট্টো।এ পর্যায়ে করাচির এক সমাবেশে এক লাখেরও বেশি মানুষের সমাবেশে প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে তাদের মতামত চাইলে জনতা সম্মতি জানায়। এরপর তিনি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন। এভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের পাঁচ দিন পর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ভুট্টো ইসলামাবাদ গিয়ে একটি ভাড়া করা পাকিস্তানি বিমানে করে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডন পাঠিয়ে দেন। সর্বোচ্চ গোপনীয়তার মধ্যে রাত তিনটায় বিমানটি ইসলামাবাদ ছেড়ে যাওয়ার ১০ ঘন্টা পর সাংবাদিকেরা এ খবর জেনেছিলেন। ততক্ষণে বাঙালির নেতা লন্ডন পৌঁছে গেছেন।

এর কয়েকঘন্টার মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনার পর লন্ডনের ক্ল্যারিজ হোটেলের বলরুমে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন বঙ্গবন্ধু। হোটেলের বাইরে তখন সমবেত হয়েছে শত শত উৎফুল্ল বাঙালি। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধুর কারাগারে থাকা অবস্থায় দেশের মানুষের জন্য তাঁর উদ্বেগ -উৎকণ্ঠা, জেলে কি অবস্থায় ছিলেন, তাঁর প্রতি কারা কর্মকর্তাদের ব্যবহার ইত্যাদির চিত্র ফুটে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্যে জানা যায়, দেশের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ আসনে বিজয়ী দলের একজন জাতীয় নেতা হিসেবে পাকিস্তান সরকার কারাগারে তাঁর ওপর চরম অন্যায় আচরণ করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিদের হাতে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়া নিয়ে কোনো কোনো মহলের একটি নেতিবাচক সমালোচনার জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তারা বলে থাকেন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং আপসের চেষ্টা করেছিলেন। এ ধরনের কথা একবারে যুক্তি ও ভিত্তিহীন, সত্যের অপলাপ মাত্র। বঙ্গবন্ধুর কিশোরকাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোনো চাপ বা হুমকির মুখে কারও সঙ্গে কোনো আপস বা আত্মসমর্পণের কোনো নজির নেই। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনার নামে ঢাকা আসার আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে গ্রেফতার অথবা হত্যা করা হবে। তিনি তাঁর আশঙ্কার কথা বলেছিলেন 'পাকিস্তান তেহরিকে ইশতেকলাল' পার্টির নেতা এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আসগর খানকে। আসগর খান তাঁর 'উই হ্যাভ লার্ন নাথিং ফ্রম হিস্ট্রি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমি মুজিবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন? চলমান অচলাবস্থা কীভাবে অবসান করা যায়? মুজিব জবাবে বললেন, 'পরিস্থিতি খুবই স্পষ্ট, প্রথমে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসবেন, তারপর আসবেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তারপর ইয়াহিয়া সামরিক অভিযানের আদেশ দেবেন এবং সেটাই হবে পাকিস্তানের শেষ।' তাঁর নিজের সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেছিলেন, তাঁর ধারণা, তাঁকে গ্রেফতার করা অথবা মেরে ফেলা হবে। আসগর খান লিখছেন, 'একাত্তরের মার্চের ঘটনার ক্রম মুজিবের পূর্বাভাসের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়, যেটা বিস্ময়কর।'

দ্বিতীয়ত: বঙ্গবন্ধু আত্মসমর্পণ বা স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করলে মুক্তির আগে ভুট্টোর প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অথবা প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। প্রহসনের বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হওয়ার পরও তিনি এমন কোনো বার্তা দেননি যে, তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে রাজি। তিনি ঐতিহাসিক ৭ মার্চ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে যেভাবে শত্রুর মোকারিলা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং গ্রেফতার হওয়ার আগে যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তা থেকেও সরে আসেননি বা বাতিল করেননি। যদি সেরকম কিছু হতো তাহলেই প্রবাসী সরকার, মুক্তিযোদ্ধা ও দেশ-বিদেশের সরকার ও রাজনৈতিক মহলে এর মারাত্মক প্রভাব পড়তো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুদূর পরাহত হতো। বরং তিনি তাঁর ফাঁসির রায় এবং তাঁর জন্য কবর খোঁড়ার দৃশ্য দেখেও তা উপেক্ষা করে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে হত্যা করো আমার তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু আমার লাশটা আমার বাংলার মাটিতে পৌঁছে দিও।' কাজেই তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন এ কথা কেবল তাঁকে এবং তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনকে যাঁরা মেনে নিতে পারেননি তাঁদের মুখেই শোভা পায়। বরং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, 'আত্মগোপন না করে গ্রেফতার হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের একটি। তিনি সংবিধান ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে ছিলেন বলেই আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন পান। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বিশ্ব জনমত তাঁর পাশে থাকে।' অবশেষে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দুদিনব্যাপী শ্বাসরুদ্ধকর প্রতীক্ষার প্রহর পেরিয়ে ১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে তাঁর ভালোবাসার মানুষদের কাছে ফিরে আসেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

#

মুহাম্মদ শামসুল হক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণাকর্মী, সম্পাদক-ইতিহাসের খসড়া।

২৬.০৮.২১ পিআইডি ফিচার